দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা কথাসাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাবগত প্রেক্ষাপটের অবয়ব নির্মাণ

বাংলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বহু শাখা-প্রশাখা পল্লবিত হয়ে বর্তমানকালে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ যাত্রার সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতাব্দীতে রচিত 'চর্যাপদ'-এর হাত ধরে হলেও মনুষ্য জীবন ও কালের নানা উত্থান-পতন মূলক যাত্রার প্রতিধ্বনি সাহিত্যিক পথ বেয়েই উৎসারিত হয়েছে। প্রাচীন যুগের বহুধা বিস্তৃত সড়ক পথ অতিক্রম করে দীর্ঘ দুশো বছর ব্যবধানের পর বাংলা সাহিত্যে মুখরিত হয়েছে তিনটি প্রধান সাহিত্যিক ধারা। প্রথমত 'মঙ্গলকাব্য', দ্বিতীয়ত 'অনুবাদ সাহিত্য', তৃতীয়ত 'বৈষ্ণব পদাবলী'। এরপর ধীরে ধীরে টপ্পা, কবিগান, খিস্তি, খেউর প্রভৃতির সহায়তায় বাংলা সাহিত্য পদার্পণ করেছে আধুনিক যুগের বহু বিস্তৃত পরিসীমায়, এই আধুনিকতার সূত্রপাত ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০খ্রী:) এবং পলাশীর ঐতিহাসিক যুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকেই। নবজাগরণের বীজমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালী সমাজে একদিকে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার, সেই সঙ্গে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, মানবতা, স্বদেশচেতনা, মূল্যবোধের জাগরণ আধুনিক যুগকে সুচিহ্নিত করতে বিশেষ সহায়তা করেছে, তবে আধুনিক শব্দটি নিতান্তই আপেক্ষিক হওয়ায় তা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য হয়েছে।

মধ্যযুগে দৈবীমহিমা ও ভক্তিরস, ঈশ্বরে অন্তরাত্মা সমর্পণই ছিল মুখ্য বিষয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের হেতু ঈশ্বর সে সময়ে পূজিত হতেন। সামগ্রিক জীবন ও গভীর মানবিক আর্তি, মর্মবেদনা প্রভৃতি বিষয়গুলি সেখানে প্রচ্ছন্নে প্রবাহিত হলেও অলৌকিক ঐশ্বরিক মহিমাকে অতিক্রম করে জীবন বাস্তবতার এক নিগূঢ়বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'বৈষ্ণবপদাবলী' সাহিত্যের বহুবিধ ছত্রে। কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে উত্তর চৈতন্যযুগের জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, প্রমুখ কবিগণ যেভাবে শ্রীমতি রাধার চিত্তদীর্ণ তীব্র আকুলতাকে মানবীয় অনুভূতির প্রেক্ষাপটে অঙ্কন করলেন, সেই প্রতিচ্ছবিই পরবর্তী সময়ে শুদ্ধ প্রেম-পরায়ণা নারীসত্তাকে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচন করলেন বৈষ্ণব কবিগণ। এই প্রেমগীতি হার নিয়ে রচিত গাঁথা আধুনিক কথাসাহিত্যের আঙ্গিনাকেও স্পর্শ করতে দ্বীধান্বিত হয়নি। তাই মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও এ সাহিত্য হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমধর্মী ও আধুনিকতার ছোঁয়া সম্পন্ন। নরনারীর হৃদয়ের এই তীব্র দাবদাহ সে সময়ের সাহিত্যের ইতিহাসকে আন্দোলিত করেছিল একথা স্পষ্টতই অনুভূত হয়।

আধুনিক সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় প্রথমেই উঠে এসেছে জীবন বাস্তবতা। এই জীবন বাস্তবতা ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বিষয়বস্তু, রচনাঙ্গিক, নানা জীবনমুখী ভাবনার পদসঞ্চারণ মধ্যযুগীয় পদ্যকেন্দ্রিক সাহিত্য থেকে গদ্যকেন্দ্রিক সাহিত্যের জন্ম দেয়। মধ্যযুগীয় ভাবনা ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে শুরু করে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আধুনিক সাহিত্যের চারটি ধারার জন্ম হয়—

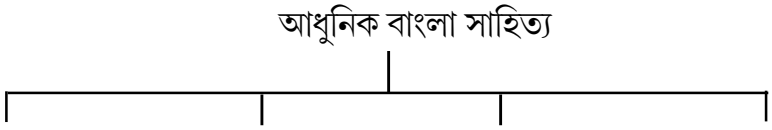

বর্তমান গবেষণা পত্রে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের তত্ত্বগত নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে আধুনিক যুগের শক্তিশালী ধারা উপন্যাস ও ছোটগল্পের নির্বাচিত লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত কথাসাহিত্যের যোগসূত্রকে অন্বেষণ করা হয়েছে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমন ও বাংলা ভাষাশিক্ষার আন্তরিক, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাংলা গদ্যের সুস্পষ্ট অবয়ব নির্মিত হয়। যদিও মধ্যযুগে ষড়গোস্বামীগণের অন্যতম শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'কারিকা'য় গদ্যের ব্যবহার করেছিলেন, তবে তার প্রকৃত শৈলী সে যুগের প্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট রূপে উঠে আসেনি। আধুনিক কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনগত প্রভাবের প্রেক্ষাপটকে নির্মাণের ক্ষেত্রে ষড়গোস্বামীগণ সহ অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থসমূহের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অন্যতম— 'বৃহৎ ভাগবতামৃত', 'দিগদর্শিনী', 'হরিভক্তিবিলাস', 'বৈষ্ণবতোষণী', 'ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা', 'জীব গোস্বামী বিরচিত কাব্য সমূহের অন্যতম 'গোপালচম্পূ', 'মাধব মহোৎসব', 'গোপালবিরুদাবলী', ব্যাকরণরস শাস্ত্রের মধ্যে 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ', বৈষ্ণব স্মৃতি ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'লঘুতোষণী', 'কৃষ্ণার্ঘদীপিকা', বিশেষত বৈষ্ণব দর্শন বিষয়ক 'ষট্-সন্দর্ভ' এবং 'সর্বসংবাদিনী'র মত গ্রন্থগুলি বাংলা কথাসাহিত্যে বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাবগত প্রেক্ষাপটের অবয়ব নির্মাণে একটি সুনির্দিষ্ট পথরেখা নির্মাণ করতে সহায়তা করেছে একথা অবশ্যম্ভাবী। ধীরে ধীরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যের বিকাশ থেকে কবিতা, নাটকের জন্ম ও সমৃদ্ধি ঘটে। এরপর অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও জটিল মানব জীবনের রস সঞ্জাত কাহিনী সম্বলিত শিল্পরূপে উপন্যাসের জন্ম হয়, একটি বৃহৎ জীবনের নানা জটিলতম দিককে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সেখানে তুলে ধরা হয়। কালক্রমে বিপুল বনস্পতির মতো নিখুঁত, নিটোল, মধুর জীবনের সংক্ষিপ্ত, অনিবার্য অথচ

বাস্তবসম্মত পাঠকের চাহিদা নিবৃত্তির নিমিত্তে নির্মিত হয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্ব নবীন অথচ সবচেয়ে প্রাণবন্ত এক সাহিত্যধারা, যার নাম 'ছোটগল্প'। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্নের প্রথম পর্বে সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপট, জীবনচেতনা এসকল বিষয়েই ছিল ঔপন্যাসিকদের প্রাথমিক পছন্দের সাহিত্যিক উপকরণ। এই আত্মসচেতন জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়েই বাংলা উপন্যাসের জন্ম। প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) নামক ব্যঙ্গ আখ্যানটিতে, অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের নাগরিক জীবনের উৎশৃঙ্খলতা, অধঃপতিত সমাজের চিত্র, ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে এই রচনায় খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের নানা বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় সবদিক থেকে সার্থক না হলেও একেই বাংলার প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। ভাষাগতদিক থেকে এই প্রথম তিনি চলিত অর্থাৎ কথ্যভাষায় উপন্যাস রচনার পথরেখা ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের সামনে প্রতিকায়িত করলেন। এ প্রসঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু-বিলাস' (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'দূতীবিলাস' (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ), 'নববিবি-বিলাস' (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সার্থক বাংলা উপন্যাস বলতে যা বোঝায় তার জন্ম হয়েছে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে। তিনিই সর্বপ্রথম উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয়কে বিকশিত করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পাদক রূপে তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ)-র মধ্য দিয়েই প্রথম যথার্থ ও সার্থক উপন্যাস রচনা করলেন এবং লেখক ও সম্পাদক উভয় রূপেই তিনি সমগ্র পাঠকের হৃদয় জয় করে নিলেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার তৃতীয় বছর ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'-এর সমালোচনা অংশে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বৈষ্ণব পদসাহিত্য কেন্দ্রিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন—

''বিদ্যাপতি এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিদের গীতের বিষয়, একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। ... তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; ... কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ-অতি কদর্য্য পাপের আধার। ... যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখনো স্থায়ী হয় না। ... কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভগবতে।''[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার মূলে ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সামাজিক নানা

প্রেক্ষাপট। নাগরিক সমাজের প্রতি মানুষের অধিক আকর্ষণ, এদিকে শহরমুখী মানুষের ভীড়, কলকাতার বুদ্ধিজীবী মানুষের নতুন জীবন দর্শন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সর্বক্ষেত্রে যুবসমাজের স্বাধীনতা, হিন্দু ধর্মের নানা সংস্কারমূলক আন্দোলন, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা অতিক্রম করে ধর্মের পুনরুত্থান ভাবনায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, উদারতা, গোঁড়ামি, পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে প্রাচ্য ভাবধারার মিলন, নারীর আত্মমর্যাদা তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধকে জাগ্রত করা প্রভৃতি সে সময়কার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর রচনায় একান্নবর্তী বাঙালী পরিবারের পারিবারিক চিত্র স্পষ্ট ভাবে উঠে এসেছে, যেমন— তাঁর উপন্যাসে তিলোত্তমা, আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, গিরিজায়া, হীরা দাসী, শৈবলিনী, কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্র প্রমুখ চরিত্রদের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা বহু অনুষঙ্গে উঠে এসেছে। বিভিন্ন উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রবল আলোড়নে, মনস্তাত্ত্বিক নানা টানাপোড়েন, আধুনিকতার সংমিশ্রণে অভিনব রূপে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চোদ্দটি উপন্যাসের মধ্যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা অন্বেষণের দিকটিকে সুচিন্তিত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অন্বেষণ করাই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বিশেষত 'বিষবৃক্ষ'-এর বৈষ্ণবী, 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া, 'আনন্দমঠ' সহ বেশ কিছু উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিক নানা পরিস্থিতিতে প্রধান, অপ্রধান বহু চরিত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে, ঔপন্যাসিক আখ্যানে প্রেমালেখ্য ও দ্বান্দ্বিকতার বয়ন জাত প্রভাব, উপন্যাসের ভাষাগত অনুষঙ্গ নির্মাণে 'পদাবলী'র নানা দিককে তুলে ধরা হয়েছে, বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের বহু আলোচিত দিক সেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে যেখানে বৈষ্ণবীয় 'প্রেমতত্ত্ব'-এর বহুবিধ কৌণিক প্রেক্ষাপট আলোচিত; বিশেষত নায়ক জগৎ সিংহের মত একজন মহৎ, উন্নত চরিত্রের পুরুষের সঙ্গে রাজকন্যা তিলোত্তমার প্রেমের সম্পর্ক থাকার পর সেবিকা আয়েষার জগৎ সিংহের প্রতি প্রেমার্তি, বিরহী, চিরদুঃখিনী চণ্ডীদাসের রাধার প্রসঙ্গ স্মরণ করায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের আয়েষা চরিত্রটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর অনুসরণকারী প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে বিমলা চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি, বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে 'প্রতাপ-শৈবলিনী'-র যে প্রেমগত সাদৃশ্যকে পাঠকের সম্মুখে উপনীত করেছেন, সেখানে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনগত প্রভাব লক্ষিত হয়েছে। সেই প্রভাব তাঁর 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ)-এর মত পারিবারিক উপন্যাসে

'নরেন্দ্র-হেমলতার' প্রেমের সম্পর্ককে সমতুল্যতা দিয়েছে। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর মত বহু আলোচিত উপন্যাসের সঙ্গে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)-র বহু আখ্যানমূলক সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমাদের আলোচ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহ পরবর্তী তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদে বিশ্লিষ্ট হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে শুধুমাত্র বৈষ্ণবীয় প্রভাবগত দিকের একটি পটরেখা নির্মিত করা হয়েছে।

এর পরবর্তী পর্যায়ে আলোচ্য গবেষণাপত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত কথাসাহিত্যের উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সূত্র ধরেই সর্বপ্রথম 'বৈষ্ণব পদাবলী' বিশ্বসাহিত্যের মঞ্চে উৎকৃষ্ট পদ্যসাহিত্য তথা মানব মানবীর হৃদয়াতিপূর্ণ প্রেমময় গাঁথা রূপে উচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ সাহিত্য ছিল একান্তই দৈবীমহিমা নির্ভর; তিনিই সর্বপ্রথম ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণার সঙ্গে বৈষ্ণবীয় সাহিত্যকে সংমিশ্রিত করেছেন। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যকে সর্বপ্রকার দৈবীবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। সীমা ও অসীমকে যেভাবে তিনি নিজ সাহিত্যে অঙ্গীভূত করেছেন, ঠিক সেইভাবেই বৈষ্ণবীয় অসীম প্রেমময় জীবন ইতিহাসকে তিনি সীমা-অসীমের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করে তাকে দিয়েছেন সমৃদ্ধশালী সাহিত্য সম্মান। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে কবির সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে বৈষ্ণব পদাবলীর। এই পদ সাহিত্যের ভাষা, ছন্দের অভিনব ঝঙ্কার, অপরূপ ভাবতন্ময়তা, রসবৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের হৃদয়কে যে পরিপক্কতা দিয়েছিল তা অন্য কোন সাহিত্য এতখানি দিতে পারেনি।

বৈষ্ণব পদাবলীর মুখ্য বিষয়ের মধ্যে যে পরকীয়া প্রেম, লোকনিন্দার ভয়কে উপেক্ষা করে যে অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ায় রাধার প্রেমকে বৈষ্ণব কবিগণ সে যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, বৈষ্ণব কবিগণের সেই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আন্দোলিত করে। তিনি সেই সাহিত্য মধ্যে অনুভব করেছিলেন রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রেমের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ। বিশ্বব্যাপী প্রেমের পূজারী রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে বৈষ্ণবীয় প্রেমরসের গভীরতা, অসীমতা নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করে। তিনি একটি নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে সাহিত্য সম্পদকে মুক্তি দিয়ে তাকে নির্বিশেষ বাংলা সাহিত্যে তথা বিশ্বের অপরূপ সংগীতে পরিণত করেছিলেন। শৈশবে তিনি শুধুমাত্র এ সাহিত্যের রসমাধুর্যে মোহিত হয়েছিলেন, পরবর্তী সময়ে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ একে আখড়ার নির্দিষ্ট ধর্মকেন্দ্রিক গণ্ডী থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় পরিবেশন করলেন। চৈতন্যদেবের মধ্যে যে মানবতার মূর্ত প্রতীকের প্রতিবিম্ব আভাষিত হয়েছিল, সেই ভাবনাকেই তিনি বাঙালি প্রাণের আত্মবিকাশের সঙ্গে যুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের নানা ব্যাখ্যা দিলেও তিনি তাকে

তাত্ত্বিক দিক থেকে সে অর্থে বিশ্লিষ্ট না করে সহজ স্বাভাবিক লৌকিক প্রেমের আখ্যানেই তাকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান'- গ্রন্থে এ বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোকপাত করেছেন। কবির ষোল থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে রচিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-র মধ্য দিয়েই তিনি বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গের আঙিনায় অনুপ্রবেশ করেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও এর উল্লেখ তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। শ্রীরাধার হৃদয়-আকুলিত শ্যামবিরহ বেদনাই এই কাব্যের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

''সমাজের লাইব্রেরি খুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে ভানুসিংহ-নামক কোন এক প্রাচীন কবির পদ কবির পদ কপি করিয়া আনিয়াছি। ... এমন কবিতা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের হাত দিয়াও বাহির হইতে পারিত না।"[২]

কাব্যটি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে যে বৈষ্ণবীয় মাধুর্য দান করেছিল তার পরবর্তী প্রভাব আমরা তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে এমনকি 'ভগ্নহৃদয়' বা 'খেয়া'-র 'বর্ষা-প্রভাত', 'বর্ষা-সন্ধ্যা', 'মানসীর'-র 'একাল ও সেকাল', 'সোনারতরী'-র 'বর্ষাযাপন', 'হৃদয়যমুনা', 'শ্যামলী'-র 'স্বপ্ন', 'কড়ি ও কোমল'-এর 'দেহের মিলন', 'মথুরায়', 'বাঁশি', 'গান' কবিতায়, 'মানসী'র 'ভাল করে বলে যাও' এমনকি 'কল্পনা'র 'বর্ষামঙ্গল', 'নববিরহ', 'নৈবেদ্য'-র 'অপ্রমত্ত' প্রভৃতি কবিতা সহ 'গীতাঞ্জলি' পর্বের বহু কবিতায় এই ভাবনাই কথাসাহিত্যে আরো প্রগাঢ় ভাবে ছায়াপাত করেছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ঐশ্বরিক মহিমার আলোক বিচ্ছুরণ বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত জীবনচর্যার মানবিক আকূতিই তাঁর রচিত 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট', 'চোখের বালি', 'ঘরেবাইরে', 'চতুরঙ্গ'-এর মত বিখ্যাত উপন্যাসের পাশাপাশি 'রাজপথের কথা', 'অনধিকার প্রবেশ', 'মানভঞ্জন', 'অধ্যাপক', 'উদ্ধার', 'দর্পহরণ', 'বোষ্টমী', 'স্ত্রীরপত্র', 'তপস্বিনী' সহ বহু ছোটবড় গল্পে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক অভূতপূর্ব দিক নির্দেশকারী সাহিত্যকণিকা। এগুলির মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে, কোথাও বা পরোক্ষে আভাসে, ভাবাদর্শগত ইঙ্গিতে তিনি বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব-দর্শনকে সম্পৃক্ত করেছেন। জীবনের জটিলতা ও আত্মপ্রকাশের সচেতন মন ও প্রতিমুহূর্তে জীবনের নবনব রূপান্তর প্রবণতার দিক চিহ্ন এখানে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে একদিকে যেমন ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বমূলক উপাখ্যান পরিস্ফুট হয়েছে, তেমনি উন্মোচিত হয়েছে দেশ, কাল, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সহস্র জটিল সূত্র। এমনকি, প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিষয় চেতনাবোধ, এক নতুনতর আত্মবিশ্বাস, নতুন শিল্পচেতনা, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের স্থির জীবনাদর্শের সন্ধান, সংস্কার আন্দোলন, জীবনকে বাস্তবগ্রাহ্য পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা, শিল্পায়ন ও পুঁজিবাদী ব্যক্তি চিন্তার প্রাধান্য, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতার মত বিষয়গুলি। বিশেষত, বাঙালির পারিবারিক জীবনের এক নতুনতর আদর্শ, বিভিন্ন সংস্কার মূলক আন্দোলন, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, রক্ষণশীলতা, ব্রাহ্ম সমাজের অভ্যুত্থান রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের পটভূমি নির্মাণে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্রের সময়কাল থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। প্রথমত, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধ্যানধারণা সহ অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের সময়ে উপস্থিত ছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্রের কালে এতখানি ব্যাপক ছিল না। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের কালের গতিশীল ভাবধারা রবীন্দ্রনাথের সময় অনেক দূর প্রসারিত হয়। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সময় সামন্ত্রতান্ত্রিক স্মৃতির বিলুপ্তি ঘটতে থাকে, তিনি একান্নবর্তী পরিবারের নানা ভাঙন দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন, যা বঙ্কিমচন্দ্রের কালেও সবলভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, জীবনের গতিশীলতা ও চরিত্র চিত্রণে বৈষ্ণবীয় ভাবকুশলতার এক প্রগাঢ় ব্যাপ্তিই রবীন্দ্র সাহিত্যকে বিশ্ব সাহিত্যের মর্যাদায় নিয়ে গেছে।

পারিবারিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঔপনিষদিক ভাবনায় দীক্ষিত ছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্র ব্রহ্মের ব্যাপ্তি, ব্রহ্মের উপস্থিতি সর্বদাই পূর্ণানন্দময়। ঔপনিষদিক এই দর্শনতত্ত্ব রবীন্দ্র মানসপটে এক আলোক প্রতিবিম্ব বিচ্ছুরিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ঔপনিষদিক ভাবনার পাশাপাশি বৈষ্ণবীয় চিন্তাচেতনার এক অনন্য দর্শন তথা এর লীলাবৈচিত্র্য, এমনকি রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বকে আপন ভাবনার আলোকে এবং নতুন ভুবন গঠন করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম ও ভক্তির এক নিবিড়তম আত্ম সম্পর্ক রবীন্দ্র সাহিত্যে তাই বারবার উঠে এসেছে। প্রেমাশ্রিত পুষ্পাঞ্জলি বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিচয় হওয়ায় পরবর্তীকালে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের রাধাকৃষ্ণ লীলা আখ্যায়িত বৈষ্ণব তত্ত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কৃষ্ণ ভগবান রূপী আনন্দাংশের স্বরূপ হওয়ায় সেই আনন্দাংশের উপভোগকারিণী রূপে শ্রীরাধার সঙ্গেই তাঁর মিলনক্ষেত্র রচিত হয়। বৈষ্ণবীয় 'অদ্বয়তত্ত্ব'-ই রবীন্দ্র সাহিত্য ও ভাষাকে পরবর্তীসময়ে সীমা অসীমের গণ্ডীতে উপনীত করে। সমগ্র বিশ্বব্যাপী অপার মানবমুখীনতার জয়ধ্বনি রাধাকৃষ্ণের 'পরম স্বরূপতত্ত্ব' বা 'যুগল সম্মিলন' বা 'অদ্বয়তত্ত্ব' রূপে রবীন্দ্র সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। তাই রবীন্দ্রনাথ 'উৎসর্গ' (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যে স্পষ্টতই বলেছেন— ভাব যেমন রূপের মাঝে অঙ্গ পেতে চায়, তেমনি রূপও ভাবের মাঝে সঙ্গ পেতে চায়, একই ভাবে অসীম যেমন সীমার সঙ্গ

পেতে চায়, সীমাও চায় অসীমের সঙ্গ পেতে।

এভাবেই মানবজীবনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সাহিত্য পথের অনুসন্ধান নিদর্শন দিতে চেয়েছেন, সেখানে তিনি একদিকে মর্ত্যপৃথিবীর চিরন্তন নারীপুরুষের প্রেমালেখ্যকে যেমন নির্মিত করেছেন, ঠিক তেমনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমময় আখ্যানকে তাঁর নানা উপন্যাস, ছোটগল্পে লৌকিক জীবনালেখ্য রূপে সীমা-অসীমের পারস্পরিক নিবিড়তায় এক অদ্বিতীয় ও অভিন্ন সত্তারূপে পুনরুদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের পর আলোচ্য গবেষণাপত্রের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছেন কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বাংলার সামাজিক, বিশেষত, পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ জীবন সৃষ্টির কাহিনী, চরিত্র, উপস্থাপনা, রস সংযোজনা, ব্যাপ্তি, অনিবার্যতা এমন এক তুলিতে অঙ্কন করেছেন যার দ্যুতিতে আধুনিক পাঠক বর্গের হৃদয় অনেকাংশে বাস্তব ও কল্পনা তথা কাহিনীর সঙ্গে তারা নিজেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করতে সক্ষম হয়েছে। সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমকে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিচার করে যে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে উন্মুক্ত করতে পেরেছেন তাতে তিনি শুধু বাঙালি পাঠকের হৃদয়েই সীমাবদ্ধ থাকেননি, জাতীয় আন্তর্জাতিক বিশেষত ইউরোপীয় সাহিত্যের আঙিনাকে স্পর্শ করতে সফল হয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাসের শুষ্ক বালুকাময় মরু প্রান্তরে তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি শীতল জলধারা সঞ্চার করতে পেরেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায়— ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কুন্তলীন' পত্রিকায় তাঁর 'মন্দির' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩১৯-১৩২০ বঙ্গাব্দে 'যমুনা' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) 'ভারতী' পত্রিকায় 'বড়দিদি' সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রচেষ্টায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হলে, সকলেই রবীন্দ্রনাথকেই ছদ্মবেশী গল্প লেখক মনে করেন। কিন্তু আষাঢ় সংখ্যায় 'বড়দিদি'র লেখক রূপে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশিত হবার পর ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের আকাশে উন্মোচিত হয় এক নতুন নক্ষত্রের। তিনি হলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মোট বাইশ বছরের সাহিত্য জীবনে তিরিশটি উপন্যাস ও একাধিক গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। জীবনের চূড়ান্ত বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করলেও তিনি জীবনের এক নতুনতম আদর্শকে রোমান্টিকতার ছকে পরিবেশন করেছেন। সামাজিক দ্বন্দ্বজর্জর নরনারীর হৃদয়ের চিরন্তন প্রেম, বিরহ, যন্ত্রণার এমন এক অসাধারণ রূপকে নির্মাণ করেছেন যেখানে অতি সামান্য বিষয় ও রচনার গুণে হয়ে উঠেছে নিপুণ শিল্পরূপ।

পারিবারিক গৃহপরিবেশ, ব্যক্তিজীবনে আখড়া সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ এমনকি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কর্মসূত্রে বর্মা গমন করলে তাঁর সংগীত প্রতিভার যে চরম বিকাশ ঘটে সেখানে বৈষ্ণবীয় রাগিনীর প্রতিধ্বনি অনুশ্রুত হয়—

''শরৎচন্দ্র প্রধানত বৈষ্ণব সঙ্গীতের সাধক হইলেও অন্যপ্রকার সঙ্গীত, বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।... শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব-সঙ্গীত-প্রীতি আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাইল 'শ্রীকান্ত' চতুর্থপর্বে। মুরারিপুরের আখড়ায় কমললতার কণ্ঠে বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত ভক্তি ভাবোচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিয়েছেন।''[৩]

বৈষ্ণব পদাবলী যেহেতু প্রেমের সাহিত্য তাই স্বাভাবিক ভাবে এই সাহিত্যের ধারক-বাহক রাধাকৃষ্ণের দ্বৈত প্রেমলীলাই এই সৃষ্টিকে নানা পরিস্থিতিতে গতিময়তা দান করেছে। এখানকার আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু তথা কৃষ্ণ, তাই কৃষ্ণ সুখ বিধানে বৈষ্ণব কবিদের রচনায় উঠে এসেছে কোথাও যৌবনোচ্ছল নায়িকারূপী রাধার উন্মত্ততা, কোথাও গৈরিক বসনা, ধূসর গৌধূলির একরাশ দরদী বেদনা সঞ্জাত বিরহী প্রাণের আকূতিতে ভরপুর সন্ন্যাসিনী রূপা, আবার কোথাও তীব্র সামাজিক সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থানকারী মানসী প্রতিমারূপে রাধা হয়ে উঠেছেন কখনো ভক্তপ্রাণা, কখনো প্রিয়া, কখনো চিরবিরহিণী নারী সত্তা। পাঠকের চিত্ত রঞ্জনে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যের বহুচর্চিত প্রেক্ষাপটে এক বৈষ্ণবীয় তত্ত্বানুষঙ্গের ঢেউ আন্দোলিত হতে দেখা গেছে। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চারটি পর্ব এ প্রসঙ্গে বড়ই প্রাসঙ্গিক, এছাড়াও 'বড়দিদি', 'বিরাজ বৌ', 'পণ্ডিতমশাই' সহ বেশ কিছু উপন্যাসের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। উপন্যাসগুলির বহু অংশে বৈষ্ণবীয় 'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত তত্ত্ব', 'স্বকীয়া-পরকীয়া তত্ত্ব'-এর বিশেষ সংযোগসূত্র প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নে অনুসৃত হতে দেখা যায়। 'পথনির্দেশ', 'আঁধারে আলো', 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ' প্রভৃতি গল্প সমূহে ও সেই প্রকার ভাবধারার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়েছে। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সমাজ বিধির প্রাধান্য চিহ্নিত দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধমূলক কাহিনীকে যেমন সতেজ করেছেন, সমাজ সমালোচনা মূলক প্রেমকে দৃঢ়তা দিয়েছেন, পাশাপাশি পূর্বরাগ বিশিষ্ট মধুরান্তিক প্রেমের কাহিনীকেও মান্যতা দিয়েছেন এবং নিষিদ্ধ সমাজ বিরোধী প্রেমকে মধ্যযুগীয় পদাবলীর সঙ্গে গভীর সাদৃশ্যে উপস্থাপিত করেছেন।

তাই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত ঔপন্যাসিক পরিকাঠামোর সচল পথেই পূর্বসূরীদের সঠিক ভাবে অনুসরণের মধ্য দিয়েই শরৎচন্দ্র বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে বিচরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি এক সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিন্তাশীলতা ও করুণ রসাত্মক আবহ নির্মাণ

করেছিলেন যা বাংলা উপন্যাসের পথরেখাকে বহুলাংশে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। নারী চরিত্র ও তাদের মনের সকল বাধা জড়তা নির্জীবতাকে ঘুচিয়ে তাকে এক দৃপ্ত তেজস্বিনীতে পরিণত করার দুঃসাহস সে সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন লেখক শরৎচন্দ্র। প্রেমময় বিশ্লেষণের অবাধ গতিময়তায় তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগকে একই রজ্জুতে গ্রন্থিত করে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা পরবর্তীকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়-এর মত প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের পথ প্রদর্শনকারী রূপে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ রূপে বিবেচিত হয়।

উত্তর শরৎচন্দ্র যুগের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাকার হলেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অমর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জনপ্রিয় ছিলেন এমন নয়, বাংলার বাইরেও তিনি সবিশেষ কৌতূহলী পাঠকের হৃদয় এক নবতম সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা ও রসবোধকে সঞ্জাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপন্যাস ও ছোটগল্প দুই সাহিত্য ভাণ্ডারেই তিনি এক তীব্র অন্তর্দৃষ্টি ও দুর্লভ বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সমসাময়িক দেশকাল, ঐতিহাসিক জীবনচিত্রকে যে সুনিপুণ লেখনীর মাধ্যমে জীবন্ত করে তুলেছিলেন, তাতে একথা বলা যা যে, তিনি প্রকৃত অর্থেই শরৎচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন বা কোন কোন ক্ষেত্রে বিচক্ষণ লেখনীর গুণে স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকেও অতিক্রম করে গেছেন। সে অর্থে তিনি প্রকৃতই শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী।

কথাসাহিত্যে মানবজীবনের নানা চরিত্রের বহু উত্থান পতনময় অধ্যায়কে বহু ব্যাপক আলোকে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাঁর উপন্যাসে মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোয় পুরাতন গ্রামীণ জমিদারীর ক্ষয়িষ্ণু রূপ, বুর্জোয়া নীতি, গ্রামীণ জনপদের অর্ধশহরে পরিণত হওয়ার চিত্র, নাগরিক জীবনের দুঃষহ যন্ত্রণা, চরিত্রহীন নারী-পুরুষের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের আবিলতা, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের দিকগুলি সুচারুভাবে পরিস্ফুট করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য নবতম জীবন রূপ নির্মাণের ক্ষয়প্রাপ্ত চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে জীবনের নৈরাশ্যকে তিনি গুরুত্ব না দিয়ে গড়ে তুলতে চেয়েছেন এমন এক সাহিত্য ভুবন যেখানে গঠিত হয়েছে নব প্রাণের বাণী।

তারাশঙ্করের জীবনবোধ, অধ্যাত্ম চেতনার বিনির্মাণে তাঁর সহপাঠী বন্ধু কমলাকান্ত পাঠক মহাশয়ের একটি বৈষ্ণব অনুষঙ্গীয় কবিতা তাকে বিশেষভাবে বৈষ্ণবীয় ভাবানুকূল ভাবতন্ময়তার দিকে আকৃষ্ট করে—

‘‘... আমি আসিয়াছি গোকুলের দূত শতধা-শীর্ণ বৃন্দারণ্য হতে

... ...

বিরহের মধু বেদনার কালি মাখিয়া যতনে জননী যশোদা তব

... ...

কানুর গরবে গরবিতদের মরমের প্রীতি শরমের পুটে লয়ে।"[৪]

বীরভূমের অতি সাধারণ বেদিয়া, বাজিকর, সাঁওতাল, আউল-বাউল, বৈষ্ণব তান্ত্রিক প্রভৃতি জনজাতির জীবনের রহস্যঘন ব্যক্তিদের জীবন, সমাজ, মনোবৃত্তিকে এক নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মাণ করতে সফল হয়েছেন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের বহুসৃষ্টি বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত পরিমণ্ডলে রচিত হয়েছে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে, প্রেম পরশে, চরিত্র চিত্রণে, ভাষাগত অনুষঙ্গ ব্যবহারে, সুমধুর ছন্দশৈলী ও গভীরতর ভাবের অন্তঃব্যঞ্জনায় 'রাইকমল', 'আগুন', 'কবি', 'রাধা', উপন্যাস এবং 'রসকলি', 'হারানো সুর', 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'সর্বনাশী এলোকেশী' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি রচনার গুণে অসাধারণত্বে আভাষিত হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুবিধ সৃষ্টি সমূহের বিভিন্ন আঙ্গিকগত সামগ্রিক পূর্ণতা দেওয়ার লক্ষ্যেই নির্মিত হয়েছে অভিনব সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট। তারাশঙ্কর উচ্চ পর্যায়ের মনন দর্শন মূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে 'রাধা'- (১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) তন্নিষ্ঠ পাঠকবর্গকে একই চিত্রলেখায় ঐতিহাসিক ও মহাকাব্যিক প্রেক্ষাপটে উন্মুক্ত করেছিলেন। বৈষ্ণবীয় উপাখ্যানকে জীবনের সাগরসঙ্গমে এমন ভাবে অঙ্কন করেছেন, যার স্রোতধারা চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে অসীমতার আস্বাদন পেতে চায়। মূলত তিনি জীবন শিল্পীর ভাবনায় নিত্য দিনের জীবনচর্যার প্রতিধ্বনি প্রেমসাধনার তাগিদ থেকেই বৈষ্ণব সাধন পদ্ধতিকে সংসারের মানবিক প্রেমের ঐশ্বরিক ভূমিকায় অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। 'রসকলি'র মধ্যে নায়িকা মঞ্জরী নিজ হৃদয়ের প্রেমাস্পদকে অন্য নারীর হস্তে অর্পণের ঈশ্বর সাধনায় যে আনন্দ উপভোগ করেছে তা জীবনের এক নতুন অনালোকিত অনুভবকে উন্মোচন করতে সহায়তা করেছে। 'প্রসাদমালা'র মত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরো এক বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত সৃষ্টিতে গোপাল ও মঞ্জরীর জীবনের জটিলতা, বিরহ মূলক অন্তর্বেদনা অভিনব আঙ্গিকে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। পল্লীগ্রামের এক নির্জন লোক চক্ষুর অন্তরালে বৈষ্ণব প্রেমাশ্রিত কাহিনী বাস্তবগ্রাহ্য প্রেক্ষাপটে অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ব্যাখ্যায়িত করেছেন। 'রাইকমল' উপন্যাসেও বাঙালি সমাজে বৈষ্ণব চর্চার রোমান্টিক আবহকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন। বৈষ্ণবীয় স্বচ্ছন্দ প্রণয়লীলা, কীর্তনানন্দের প্রেমময় সংগীত, ললিত কলার অনুরাগ ও নৈপুণ্য স্বভাবের উদারনৈতিকতা, প্রেমময় মাধুর্য, মহাপ্রভুর আদর্শ নির্মিত চরিত্র হিন্দু বৈষ্ণবীয় বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিকতার মধ্যে এক স্বাতন্ত্র্যের

বার্তা নিয়ে আসে। উপন্যাসটির সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের কমললতা চরিত্রের বহু সাদৃশ্য লক্ষিত হতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে তিনি শরৎচন্দ্রীয় ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন। 'রাইকমল' উপন্যাসেও কমলিনী চরিত্রের স্বপ্নবিভোর তন্ময়তা, বাস্তব গ্রাহ্য পার্থিব ও অপার্থিব জগতে বৈষ্ণবীয় ভাবধারার উত্তরণ নানাবিধ আসক্তি, বৈরাগ্য, পার্থিব ও ঐশী প্রেমের অবিরত প্রবহমান অন্তর্দ্বন্দ্ব এক অভাবনীয় প্রেমাবেশে ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর অঙ্কন করেছেন। পদাবলীর সুরে নির্মিত নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কে প্রক্ষোভ, সুপ্তবাসনা, বৈষ্ণবীয় চেতনা এক নিবিড় আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিবেশে টানটান উত্তেজনায় জীবন সম্পৃক্ত ভাবনায় পাঠককে বারবার মোহাবিষ্ট করেছে।

ঠিক তারাশঙ্করের সমসাময়িক কালপ্রবাহে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী 'ময়ূরাক্ষী' (১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), 'গৃহকপোতী' (১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'সোমলতা' (১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) এই তিন খণ্ডে 'নতুন ফসল' নামে বৈষ্ণব ভাবাশ্রিত এক ট্রিলজি নির্মাণ করেন। তবে তাঁর উপন্যাসে বৈষ্ণব বৈরাগীগণের জীবন অতিরিক্ত আদর্শবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। তারা মূলত জীবনের প্রতি এক প্রকার ঔদাসীন্যের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সামাজিক সংশ্রব থেকে খানিক বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনমুক্তির আনন্দেই বিভোর হয়েছেন। তাদের সাধনায় সে অর্থে আড়ম্বর নেই, জীবনের সহজ, সরল, ক্ষুদ্রতম আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করেই তারা মুক্তির স্বাদ পেতে আগ্রহী হয়েছেন। তারাশঙ্করীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত লেখকদের বহু রচনায় এভাবে বৈষ্ণবীয় ভাবনা ছায়াপাত করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য নিঃসঙ্গেহে আধুনিকতার দিক নির্বাহী এক স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রূপে সুচিহ্নিত। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যুক্তিবাদী, আধুনিকতার স্পর্শ থাকলেও পরবর্তীকালে উত্তর-আধুনিক প্রেক্ষাপটে তিনি ঐতিহ্য, ভক্তিবাদ ও রক্ষণশীলতাকে বিশেষ ভাবে ইঙ্গিতায়িত করেছেন। তিনি আধুনিকতার নবজাগরণিক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও বহুক্ষেত্রে হিন্দুধর্মীয় রক্ষণশীল মনোভাবকে সাহিত্যিক আদর্শের উর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু রক্ষণশীলতার মধ্যেও তিনি যুক্তিবাদকে কখনো অবহেলা করেননি। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে স্বয়ং তিনিও আধুনিকতার পাশাপাশি রক্ষণশীলতা সর্বক্ষেত্রে না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত 'চোখের বালি' সহ অন্যান্য বেশ কিছু সাহিত্যিক রচনায় বৈধব্য যন্ত্রণায় বিলীয়মান নারীর মর্যাদাকে দৃপ্তভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে কুণ্ঠিত থেকেছেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব জর্জরতার পাশাপাশি মানবীয় আর্তি, সমাজবোধ, জীবনের নানা পরিসংখ্যান ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব ভাবনাকে অঙ্গীভূত হতে

লক্ষ্য করি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই আলোচ্য গবেষণাপত্রের বৈষ্ণব ভাবনার প্রভাবগত প্রেক্ষাপটে অবয়ব নির্মাণের দিককে বিচার করে বলা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবীয় চেতনাগত নিগূঢ় মানবতাবাদ আধুনিক সাহিত্যিকদের অবচেতন মনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল সেই আলোড়নের ঢেউ-এ তাদের সাহিত্য সৃষ্টির বহুছত্রে দেবতা ও মানুষ মিলেমিশে এক গহন প্রেমময় সমুদ্রে পদার্পণ করেছে। এই প্রেক্ষাপটের অনুসন্ধান উক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হওয়ায় তার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবিকে খানিক বিশ্লেষণে তুলে ধরা হয়েছে ঠিকই, তবে প্রত্যেক লেখকের লেখকসত্তায় বৈষ্ণবীয় চেতনার প্রভাব বিস্তৃতি বা স্বল্প পরিসরে হলেও প্রভাবিত করেছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় যে, 'চর্যাপদ'-ই প্রাচীন যুগের প্রথম ও একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে যেমন পরিচিতি লাভ করে, তেমনি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' বা মধ্যযুগে বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য আরো এক প্রেমময় সাহিত্য হিসেবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। কালের অগ্রগতিতে মধ্যযুগীয় সময়পর্বে বিশেষত ষোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম অঙ্কুর রূপে এই কাব্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই যে ব্রজলীলা, শৃঙ্গার রস, রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক অধ্যাত্মলীলা সাহিত্যিক পট পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, সেই মানসীপ্রেমের ভাগবতীয় ভক্তির বাস্তবগ্রাহ্য উপস্থাপনা, প্রেমপাত্রকে পাবার ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের চিত্র আধুনিককালের কথাসাহিত্যে বহু লেখকের সুনিপুণ রচনাশৈলীকে প্রভাবিত করেছে তা যেমন বলা যায়, তেমনি দৈবী মহিমায় এমন নিখুঁত মানবায়ন বা মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্রের মাধ্যমে রচিত লৌকিক তথা মর্ত্য পৃথিবীর বিশেষত আধুনিক যুগের সাহিত্যে যেভাবে উঠে এসেছে, তা নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব প্রভাবগত প্রেক্ষাপটের কাছে ঋণ স্বীকার করেই। তাই মধ্যযুগীয় কালপর্বে দাঁড়িয়ে এমন এক রসসিক্ত সৃষ্টি একালের সাহিত্যে বহুমাত্রা অতিক্রম করে স্বাভাবিক পথেই উঠে এসেছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ভূমিকা), সম্পাদক: শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৪৮, পৃ. ১-২।

২. 'জীবন স্মৃতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-৭১, বিদ্যালয় পাঠ্য সংস্করণ:

অগ্রহায়ণ ১৩৮০, পুনর্মুদ্রণ: মাঘ ১৩৮২: ১৮১৭ শক, পৃ. ৮৫-৮৬।

৩. ‘শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্য বিচার’, ড. অজিতকুমার ঘোষ, শিল্পীসংস্থা, ১৬৩, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র, ১৩৬৭, পৃ. ১১৭।

৪. ‘আমার পিতা তারাশঙ্কর’, সরীৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২৫ শে বৈশাখ, ১৩৬৭, পৃ. ৬০-৬১।